PRAG CONSILIENCE: ISSN 2456-6861, RNI No. ASSMUL/2016/70132
A Multi-lingual Peer-reviewed Annual Research Journal
of Humanities and Social Sciences, Science and Commerce
Vol.4, No.1 (2019), pp. 116-130

আখ্যানের সন্ধানে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বাংলা উপন্যাস

IN SEARCH OF NARRATIVE IN BENGALI NOVELS OF THE BRAMHAPUTRA VALLEY

ড° জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত *

Abstract: *When we try to critically analyse literary contributions of a particular region, it obviously tend to find out the internal uniquness of the creation. The bengali novels written in Bramhaputra valley bear such characteristics for the purpose. The history of migration or settlement of Bengali speaking people in this region can be traced back to 13th century. Some of their successors contributed in modern Bengali literature from 19th century itself. But the valley got its first Bengali novel only in 1967. From then the novelists of the region have made a sizable contribution to the Bengali literature. In recent time a subtle change have been noticed in theme selection, manifestation and the manner of addressing different social issues arround them. Migration and settlement, relentless displacement, social constraints and conflict, resentment, existence issues and the cultural-linguistic harmony etc. are rapidly replacing certain customary approach of early days with firm reliability. This has already began to create a new narrative of Bengali novels as a whole. In this analysis we have tried to find out the uniqueness of this narrative.*

Keywords: Narrative, Migration, Cultural-linguistic harmony

১.০ প্রস্তাবনা

'ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বাংলা উপন্যাস' বা যদি বলা যেত অসমের বাংলা উপন্যাস'— ঠিক এই সময়ে দাঁড়িয়ে নির্দিষ্ট বাক্যবন্ধটি উচ্চারণে যেমন একটি তৃপ্তি রয়েছে, তেমনি রয়েছে অসম্পূর্ণতার প্রতিভাস। সুতরাং শিরোনামটির মাধ্যমে আমরা যে জায়গাটায় পৌঁছতে চাইছি, সেখানে পথের সীমা বা সীমান্ত কিছুই নেই— শুধু রয়েছে একটি

Associate Professor, Department of Bengali, Pragjyotish College, Guwahati-9, E-mail: sgjyoti2@yahoo.in

হালকা আভাস। তৎসময়ের সত্যকে একেবারে অস্বীকার করে এখানে কোনো ছায়াকল্প তৈরি করা হয়নি। অন্ততপক্ষে বর্তমান আলোচনার সীমিত পরিসরে যে তথ্যগুলো আমাদের চোখে ধরা পড়েছে, তা এই প্রত্যয়ে অবশ্যম্ভাবী যে, অসমে বা বিশেষভাবে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বাংলা উপন্যাসের আখ্যান স্বকীয়তায় পরিপূর্ণ। আমরা অস্বীকার করতে পারি না যে, বাংলা সাহিত্য চর্চার এই ভুবনে পরম্পরাক্রমে টানাপোড়েনের আখ্যান প্রবাহিত হয়ে চলেছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। আর এটাও অস্বীকার করতে পারি না যে বাংলা উপন্যাসের জন্মলগ্ন থেকে বিভিন্ন পাঠকৃতিতে এই টানাপোড়েনের আখ্যানকেই আমরা জেনে নিতে চেয়েছি। সেই আখ্যান এই ভুবনের সাহিত্য সীমায় যে একান্তই দুর্লভ, তা বলা যায় না কোনোভাবেই। তাহলে কোন স্থানিক পরিচয়ে তাকে ঋদ্ধ করতে চাইব? চাইব কি আঞ্চলিক উপন্যাসের পরিসরে তাদের প্রতিষ্ঠিত করতে? বা এই তাগিদ আমাদের নেই বলেই আমরা যেতে চাইছি বিশেষ থেকে নির্বিশেষে। একদিকে বলছি 'ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার' আর একদিকে তার আখ্যানকে— অন্তত যে আখ্যান আমাদের পাঠ অভিজ্ঞতায় স্ফুটতর হয়ে উঠছে, তাকে, প্রসারিত করে দেখতে চাইছি বাংলা উপন্যাসের অঙ্গনে। এই প্রচেষ্টা এক দিক থেকে অসম্পূর্ণ প্রতিবেদন। এর একটা কারণ অবশ্যই পাঠকৃতির অপ্রতুলতা— আবার কারো মতে লেখকের উপন্যাস বোধ দানা বাঁধা বা পাঠকৃতির ওজস্বিতার অভাব। অন্যদিকে এযাবৎ প্রকাশিত উপন্যাসের কক্ষপথে সার্বিক বিচরণের চেষ্টাও এখানে নেই। কিন্তু আমাদের প্রকৃত অন্বিষ্ট হল পাঠকৃতির তাৎপর্য সন্ধান। অন্তত পক্ষে আমাদের সন্ধানী দৃষ্টিতে যা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বাংলা উপন্যাস নির্মিতিতে আখ্যান ভাবনাকে তাৎপর্যমণ্ডিত করে তোলে। কেননা আমরা জানি সুনির্দিষ্ট নির্মিতির মধ্যে সংহত ও সংগঠিত বাচনের সাহায্য ছাড়া তাৎপর্যে পৌঁছানো অসম্ভব।[১] তাই আপাতত আমাদের আখ্যান সন্ধান। একটা ভিন্ন আবহে লিখতে বসে যে পাঠকৃতির নির্মিতি সম্ভবপর হয়ে ওঠে, তার আখ্যানের তাৎপর্য বাংলা উপন্যাসের অঙ্গনে অনায়াসে বৃহত্তর সম্ভাবনায় সংযুক্ত হতে পারে। প্রাসঙ্গিক বোধে বলা যায়, জুলিয়া ক্রিস্তেভা অন্তর্বয়নের যে ধারণাটি উপস্থিত করেছিলেন তা হল— কোনো নির্দিষ্ট পাঠকৃতির ভেতরে কখনো প্রচ্ছন্ন, কখনো নাতিপ্রচ্ছন্ন ভাবে রয়ে যায় আরও অনেক বিস্মৃত ও বিস্মৃতপ্রায় পাঠের ইশারা। উপন্যাস স্বভাবত অন্তর্বয়ন নির্ভর। ঐতিহ্যের যে আয়তনে তাঁর নিজের বিস্তার, সেখানে পুঞ্জীভূত বহু আখ্যান বা বহু কথকতার স্মৃতিতে সে বারবার অবগাহন করে।[২] ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বাংলা উপন্যাসে আমরা সেই অন্তর্বয়নেরই সন্ধান করি। সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব, জনমানসিকতা, কেন্দ্র-প্রান্ত বিভেদ, অস্তিত্ব, অস্তিত্বহীনতা ইত্যাদি প্রত্যক্ষ বাচনের সঙ্গে বিভিন্ন পাঠকৃতিতে নানা পার্থক্য ও সমান্তরালতায় নির্মিত বাচনের মূলে রয়েছে এই অঞ্চলের শতধাচ্ছিন্ন বাঙালি সত্তার আখ্যান।

২.০ সন্দর্ভের উদ্দেশ্য

উনিশ শতক থেকেই ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় উপন্যাস লেখা শুরু হয়েছে। তবে ধীরে ধীরে তা একটি নির্দিষ্ট গতি পথে চলতে শুরু করেছে কুড়ি শতকের ষাটের দশক থেকে। আশির দশক থেকে তা তীব্রতা পেয়েছে এবং ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাও তাতে সামিল হয়েছে। অবশ্য সংখ্যার বিচারে তা অপ্রতুল। কিন্তু সংখ্যা নয়, সময় ও পরিসরকে তুলে ধরার নিরিখেই তা আপামর বাঙালি পাঠকের আগ্রহের বিষয় হয়ে উঠার উপযুক্ত। এই দুটি প্রেক্ষিত থেকে এখানে বাংলা উপন্যাসের এক নতুন 'ন্যারেটিভ' বা আখ্যান তৈরি হয়েছে। সেই আখ্যানের স্বরূপ সন্ধান বর্তমান সন্দর্ভের উদ্দেশ্য।

Scanned with OKEN Scanner

৩.০ পরিসর ও পদ্ধতি

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বাংলা উপন্যাসে আখ্যানের সন্ধান মূলত এতদঞ্চলের পাঁচজন প্রথিতযশা লেখকের পাঁচটি উপন্যাস অবলম্বনে। সেগুলো যথাক্রমে কুমার অজিত দত্তের 'বেদুইন', দেবীপ্রসাদ সিংহের 'দেশ', মানিক দাসের 'ও ঝিঙেফুল বোলো তারে', মৃদুলকান্তি দে-র 'দ্য লাস্ট সিটি' আর সমর দেবের 'লোহিত পারের উপকথা'। এই আকর গ্রন্থগুলো থেকে সংলাপ বা বর্ণনা তথা বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ থেকে উপযুক্ত বাক্যাংশ উদ্ধৃতি হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে এবং বিশ্লেষণে বর্ণনা-ব্যাখ্যানমূলক পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে।

৪.০ ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বাঙালির ইতিহাস

এই সূত্রে পাঠকের কৌতূহল স্বভাবতই অসমে বা বিশেষভাবে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বাঙালিদের বসবাসের ইতিহাসের দিকে চোখ ফেরায়। বলতে দ্বিধা নেই এই ইতিহাস শতাব্দী অতিক্রমী। গবেষক-আলোচকদের মতে এই ইতিহাস আনুমানিক ষোড়শ শতক থেকেই রচিত হতে শুরু করেছে।[৩] অবশ্য এই সত্যটি বরাক উপত্যকা সম্বন্ধে স্বীকৃতি। কিন্তু ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায় ত্রয়োদশ শতকে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় রাজা দুর্লভ নারায়ণের রাজত্বকালে গৌড় থেকে সাত ঘর ব্রাহ্মণ ও সাত ঘর কায়স্থ এসেছিলেন। ড. মহেশ্বর নেওগ সম্পাদিত 'গুরু চরিত কথায়' এর নির্দিষ্ট প্রমাণ আছে।[৪] এঁদের মধ্যে কায়স্থ চণ্ডিবর মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শংকরদেবের পূর্ব পুরুষ। এই উল্লেখ সুপ্রাচীন আমল থেকে বাংলা ও অসমের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ তথা গৌড়বঙ্গ অধিবাসীদের অসম ভূমিতে অবস্থানের একটি স্বীকৃত দলিল। তাছাড়া ব্রিটিশের শাসন কালেই যে রাজনৈতিক মানচিত্র তৈরি হয়ে গিয়েছিল (১৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দ), সেই 'আসাম প্রদেশ'-এ শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলা অঙ্গীভূত ছিল। অসম ভূমিতে বাঙালির অধিষ্ঠান নিশ্চিত হয়েছিল এভাবেও। তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকার মূলত চাষ-আবাদের জন্য ব্রহ্মদেশ থেকে বরাক ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বাংলাভাষীদের প্রব্রজন নিশ্চিত করেছিল। তবে আরও আগে আহোমরাজ পুরন্দর সিংহ বা স্বর্গদেও রুদ্রসিংহের আমলে বাঙালি রাজ কর্মচারি নিয়োজিত হয়েছিলেন। এই সমস্ত সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক সম্বন্ধের সূত্রেই ভারতীয় উপমহাদেশের এই প্রান্তীয় অঞ্চলে বাঙালিদের অবস্থান নিশ্চিত হয়ে উঠেছিল। ফলে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষেও অফিস, কাছারিতে কাজের সুবিধার জন্য বঙ্গদেশ থেকে পারদর্শী আমলাদের অসমে নিয়ে আসাটা খুব একটা সমস্যার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়নি। জেন্‌কিনস্‌কে লেখা একটি 'নোট'-এ লেফটেনান্ট মেথি জানিয়েছিলেন যে, অসমিয়া করণিক না পাওয়ার জন্যই তিনি বাঙালি বাবুদের কাজে নিযুক্ত করেছেন। এই বাঙালি বাবুরাই অসমে বাংলা ভাষা প্রচলনে ইংরেজ সরকারকে প্ররোচিত করেছিলেন— এমন একটি মিথ অসমিয়া জনমানসে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং এখনো তা অনেকাংশেই সজীব। যদিও দুজন প্রখ্যাত গবেষক প্রসেনজিৎ চৌধুরী ও শিবনাথ বর্মন এই মিথের গ্রহণযোগ্যতা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছিলেন এবং তাকে সদর্থকভাবে নাকচ করে দিয়েছিলেন।[৫] যাইহোক সেই ব্রিটিশ শাসনপর্ব থেকেই অসম ভূমিতে অসমিয়া ও বাঙালিদের মধ্যে মৈত্রী ও মনান্তরের সম্পর্ক বিদ্যমান। সেজন্যই বলা যায়, যে ইতিহাস অসমে বাঙালির শতাব্দীপ্রাচীন অবস্থান ও আত্মনিবেদনকে সমর্থন করে, সেই ইতিহাস উনিশ, কুড়ি এবং একুশ শতকের বর্তমান পরিধি পর্যন্ত অসমিয়া ও বাঙালির দ্বান্দ্বিক অবস্থানকেও স্বীকৃতি দেয়। আবারও বলি, অসম ভূমির বর্গ চিহ্নিত সমাজে আহোম রাজত্বেই শুরু হয়েছিল টানাপোড়েনের রাজনীতি— রচিত হয়ে চলেছিল আধিপত্য বিস্তারের, মেনে নেবার ও মানিয়ে নেবার কাহিনি। উনিশ শতকে ইংরেজ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর নতুন করে বাঙালিদের আগমনে যে পৌর সমাজ এই ভুবনে গড়ে উঠতে শুরু করে, সেখানেই মোড় নেয় ইতিহাস, শুরু হয় টানাপোড়েনের নতুন অধ্যায়। এখানকার বাঙালি ঔপন্যাসিকদের মনোভূমিতে যে বীজগুলি

Scanned with OKEN Scanner

রয়েছে তাতে এই পর্বের ইতিহাস কাল পরম্পরায় সঞ্চিত হয়ে রয়েছে। এই প্রেক্ষাপট থেকে পাঠকৃতির যে বর্ণমালা তৈরি হয়েছে এযাবৎ সেখানে তুলে ধরার প্রয়াস করা হয়েছে জাতির আশা-আকাঙক্ষা, আধিপত্যের ছবি, প্রতাপপিষ্ট অধস্তন বর্গ সমাজের আত্মনিমজ্জন, সত্তা সংকট ও বিমানবায়নের পরিসরকে।

৪.১ ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বাংলা উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত পরিক্রমা

একান্ত প্রয়োজনেই এখানে আমাদের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা থেকে প্রকাশিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের কথা বলতে হচ্ছে এবং সেটা ইতিহাসের ধারাবাহিকতা রক্ষার প্রয়োজনেই। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় রচিত এবং প্রকাশিত প্রথম উপন্যাসটির খোঁজ পাওয়া যায় সুধীর সেন রচিত গবেষণা গ্রন্থ 'বাংলা সাহিত্যে আসামের বাঙালিদের অবদান'-এ। সেখান থেকে আমরা খবর পাই গুয়াহাটি নিবাসী সুবিমল মজুমদারের উপন্যাস 'কল্পনা' প্রকাশিত হয় ১৩৭৪ বঙ্গাব্দে (১৯৬৭)। এর প্রকাশক ছিলেন গুয়াহাটির বাসনা স্টোর্স, বা এখনকার মডার্ণ বুক ডিপো। নিবন্ধকার এই উপন্যাসটি চোখে দেখেননি। সম্প্রতি আরও একটি উপন্যাসের খোঁজ পাওয়া গেছে, যার রচয়িতা নির্মল চৌধুরী এবং উপন্যাসটির নাম 'ইন্দিরা ওভারব্রীজ' (১৯৬২)। প্রকাশকালের দিক থেকে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাকে কেন্দ্র করে লেখা উপন্যাস এটিই প্রথম। সম্প্রতি সুশান্ত কর-এর সম্পাদনায় উপন্যাসটির নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে (২০১৫)। সম্পাদকের বর্ণনা থেকেই জানতে পারি নির্মল চৌধুরীদের পরিবার কর্মসূত্রে শিলচর থেকে এসে পৌঁছেছিলেন ডিগবয়ে। উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৬৯ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাকে এরপর অপেক্ষা করতে হল দীর্ঘ চল্লিশ বছর। একুশ শতকের একেবারে প্রথমেই এই উপত্যকা পেল অঞ্জলি লাহিড়ীকে। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'বিলোরিস' মেঘালয়ের জনজীবনকে নিয়ে লেখা। এরপর একে একে তিনি লিখলেন 'পাম ভিউ নার্সিংহোম', 'জগজ্যোতি' এবং 'সোনার সিঁড়ির উপকথা'র মতো উপন্যাস। প্রায় একই সময়ে বিকাশ সরকার ও সমর দেব উপন্যাস লেখায় মনোনিবেশ করেছিলেন। দুজনেরই গত শতকের শেষ পর্বে লেখা উপন্যাসগুলো এই সময় থেকে একে একে প্রকাশ পেতে শুরু করে। বিকাশ সরকারের প্রকাশিত উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে 'লেন্দু রায়ের জিজীবিষা', 'আগুনের সেঁক', 'অস্ত্র' ইত্যাদি। সমর দেব লিখেছেন 'পরিপ্রেক্ষিত', 'এক যুগ আত্ম প্রতারণা', 'একটি গল্পের সুলুক সন্ধান', 'লোহিত পারের উপকথা' ও 'নীল অন্ধকার'। ২০০৫ সালে গুয়াহাটির পূর্বাশা সাহিত্য গোষ্ঠী থেকে শুভঙ্কর রায়চৌধুরীর সম্পাদনায় 'নবদিগন্ত' নামে ছয়টি উপন্যাসের সংকলন প্রকাশিত হয়। এখানে সম্পাদক ছাড়াও অনিতা দে, দীপঙ্কর রায়চৌধুরী, মঞ্জু দাস, নিশুতি মজুমদার ও পটলচন্দ্র গিরির উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল। নামে উপন্যাস হলেও এগুলোকে বড়ো গল্প বললেও অত্যুক্তি হয় না -- তবে সংকলক এদের উপন্যাস বলেছেন, তাই আমরাও এই অভিধাই ধরে রাখলাম। কুমার অজিত দত্তের উপন্যাসিক অধ্যায় শুরু হয়েছে 'মৃত্যুহীন' উপন্যাসটি দিয়ে। এরপর তিনি লিখেছেন 'সেই সময় এই সময়', 'ভিটে মাটি', 'বেদুইন' ইত্যাদি উপন্যাস। দেবেশ মিত্র এবং মুক্তিদেব চৌধুরী দুজনই একটি করে উপন্যাস লিখেছেন। দেবেশ মিত্র লিখেছেন 'লোহিত কথা' আর মুক্তিদেব চৌধুরী লিখেছেন 'সেই তো আমার আমি'। সব্যসাচী লেখক মানিক দাস বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বাংলা উপন্যাস লিখেছেন। 'ও ঝিঙে ফুল বলো তারে', 'আধো আলো আধো অন্ধকার' 'আশপাশের মানুষজন' ইত্যাদি নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। তুষার কান্তি সাহা লিখেছেন 'কৈশোর সংলাপ', 'রকবাজ', 'জীবনের আশেপাশে'। গুয়াহাটির বাংলা দৈনিক 'সময় প্রবাহ' ধারাবাহিক ছেপেছিল বিষ্ণু ভৌমিকের 'কুশিয়ারার কান্না'। মৃণালকান্তি সাহা *রঞ্জন সেন* ছদ্মনামে লিখেছেন 'জীবনের স্রোত'। এছাড়া পরিতোষ তালুকদার লিখেছেন বেশ কয়েকটি উপন্যাস যেমন 'আত্মগ্লানির অন্ধকারে', 'নষ্ট মেয়ে তবু মা', 'চুরির শব্দ মাখা হাত', 'আঁধারের অতিথি'। কুশল ভট্টাচার্য লিখেছেন

Scanned with OKEN Scanner

'ধুলাখেলা' উপন্যাসটি। এই সংক্ষিপ্ত পরিক্রমায় অনবধানবশত হয়তো কেউ কেউ বাদ পড়ে গেলেন। অথবা এমনটাই হতে পারে কোনো লেখকের কোনো একটি বা দুটি উপন্যাস এখানে অনুল্লিখিত রয়ে গেল। কিন্তু আগেই বলেছি সার্বিকভাবে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় প্রকাশিত উপন্যাসের তালিকা নির্মাণ বর্তমান নিবন্ধকারের উদ্দেশ্য নয়। বরং বিভিন্ন উপন্যাসের মধ্যে আখ্যানের যে তাৎপর্য ফুটে ওঠে তারই সুলুক সন্ধান বর্তমান নিবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য। সেজন্য এখানে আরো দুটি উপন্যাসের নাম উল্লেখ করতে চাই। প্রথমটি মৃদুলকান্তি দে-র লেখা 'দ্য লাস্ট সিটি' এবং দ্বিতীয়টি দেবাশিস তরফদারের লেখা 'শরাইঘাট : একটি প্রেমকাহিনী'। এঁদের দুজনেরই আরও উপন্যাস আছে। এছাড়া চিন্ময় কুমার দাস 'গুয়াহাটি শহরে হঠাৎ আতঙ্ক', মালা চক্রবর্তী 'দীঘল তরঙ্গ' এবং সজল পাল 'হাজার কণ্ঠে মা' উপন্যাসের স্বল্প পরিসরে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার আখ্যানকে সমৃদ্ধ করতে চেয়েছেন। রজত কান্তি দাসের মতো কেউ কেউ ইংরেজিতে লিখছেন, সেই উপন্যাসগুলো অবশ্য আমাদের বর্তমান পরিসরের অন্তর্গত নয়।

৫.০ আখ্যান ও কথাবস্তু

যাইহোক, ফিরে আসব মূল প্রসঙ্গে। আমাদের আলোচ্য বিষয় উপন্যাসের আখ্যান। 'আখ্যান' এমন একটা শব্দ যা কখনো অতীতের দিকে চলে যায়, হয়ে ওঠে ইতিহাস বা অতিকথা ; যা কল্পনার আশ্রয় নিয়ে হয়ে ওঠে উপন্যাস; যা অনেকের সঙ্গে বিনিময় গড়ে তুলে হয়ে ওঠে বাচন অথবা সংযোজন বা কখনো সংজ্ঞার মতো কঠিন ও অনড় হয়ে উঠতে পারে। যা ইতিহাস তা অতীত থেকে ভবিষ্যতের দিকে যায়। আর যা বিন্যাস, তা-ও বর্তমান থেকে অতীতে ও ভবিষ্যতে যেতে পারে ।[৬] এই বিন্যাসের জন্যই সে সম্প্রসারিত হয় অতীত থেকে ভবিষ্যতের দিকে। অবশ্য বিশ শতকে আখ্যান তত্ত্ব বা Narratology-র হাত ধরে 'আখ্যান' শব্দটির অর্থ বা দ্যোতনা বহুধা বিভক্ত। সেই সূত্রেই আমরা জানি, আখ্যান হল এক বা একাধিক কথকের দ্বারা এক বা একাধিক আখ্যান গ্রাহকের উদ্দেশ্যে এক বা একাধিক বাস্তব বা কাল্পনিক ঘটনার পুনঃকথন।[৭] এই আখ্যানের দুটি অংশ; কাহিনি এবং সন্দর্ভ। কাহিনি হল ঘটনাবলির কালগত ক্রম আর সেই কাহিনি উপস্থাপনের ধরন হল সন্দর্ভ। কাহিনি ও সন্দর্ভের আন্তঃসম্পর্কের ব্যক্ত রূপ হল আখ্যান। কাহিনিতে প্রকৃত কালানুক্রমিক ঘটনাবলি এবং সেই ঘটনাবলিতে অংশগ্রহণকারী চরিত্র ও বিষয়ের সমাবেশ ঘটে। এ ধরনের কাহিনির উপস্থাপনকেই পাঠকৃতি বলে। লেখক তথা পাঠকর্তা তাঁর অভিপ্রায় অনুযায়ী ঘটনাবলি বিন্যস্ত ও উপস্থাপিত করেন। উপস্থাপন করার প্রক্রিয়াটিকেই বলে কথন। পাঠকৃতির মাধ্যমে পাঠক কাহিনি এবং কথনের ধারণা লাভ করেন। পাঠকৃতিতে কাহিনি না থাকলে তা আখ্যান হয়ে ওঠে না। সুতরাং আখ্যান হল যুগপৎ কাহিনির নির্মাণ ও বিনির্মাণ, ঘটনা বিন্যাসের ক্রম অক্ষুণ্ণ রাখা আবার সেই ক্রমের রৈখিকতা ভেঙে দেওয়ায়। এভাবে দেখলে যাকে চিরাগত বাস্তব বলে মনে হয় তা দূরে সরে যায় এবং এই বাস্তবকে সরিয়ে আখ্যান হয়ে ওঠে এক বিকল্প বয়ান। অবশ্য এই বয়ান নির্মাণ বটে, কিন্তু একান্ত অলীক বস্তু নয়। অন্তর্বয়নের সূত্রেই এই বিকল্প বয়ান পাঠকের জ্ঞানের ভাণ্ডারে বা বাস্তব অভিজ্ঞতায় পরিবর্তিত হয়। এই জ্ঞানই পাঠককে নিয়ে যায় বর্ণিত কাহিনির অভ্যন্তরে তাৎপর্যবাহী কাহিনির দিকে। আমাদের আলোচ্য উপন্যাসগুলোতে, যা অসমের তথা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার আর্থ-রাজনৈতিক-সামাজিক পটভূমিকায় রচিত হয়েছে, তাদের ভেতরে এই জ্ঞান নির্মিতির প্রয়াস প্রকট। এখানে যে বাস্তব নির্মিত হয়েছে তা অর্জিত অভিজ্ঞতার ওপর আধারিত চিন্তা-জিজ্ঞাসা-অনুভূতির নির্যাস দিয়ে পুনর্গঠিত হয়েছে। এই গ্রন্থনায় বহমান সময়ের আলো-আঁধার নিবিড়তা এবং অপরতার বোধ নৈকট্য ও দূরত্ব ইত্যাদি স্বতশ্চল ভাবে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে। এরকম হলেই কাহিনি আর নিছক তথ্য ভারাক্রান্ত সাংবাদিকতা করে না, গল্পের মনোরঞ্জক মায়া দিয়ে পাঠকের জন্য ইচ্ছা পূরণের আয়োজনও করে না। আর তখনই

Scanned with OKEN Scanner

উপন্যাস ধীরে ধীরে চিহ্নায়িত হয়ে ওঠে, বাচনের শিল্প একটু একটু করে সংকেতের দ্যোতনা সৃষ্টিতে বেশি মনোযোগী হয়ে ওঠে। তার মানে, কাহিনির আদল ঠিক রেখেও বয়ানের মধ্যে জাগিয়ে তোলে কাহিনির উদ্বৃত্ত পরিসর।[৮] এই পরিসরে সম্ভাবনাগুলো বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের দিকে যাতায়াত করে।

৫.১ ভূ-সম্পর্কিত আখ্যান থেকে মহাআখ্যানের দিকে

অসমে বাঙালিদের অবস্থান সম্পর্কে যে ছবির উপস্থাপনা করা হয়েছে, তাতেই আছে পাঠকের জ্ঞান নির্মিতির পর্যাপ্ত উপকরণ। এতদঞ্চলের মানুষের জমিয়ে রাখা স্মৃতিকথায় শুধু নয়, বহমান সময়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা পীড়িত নাগরিক জীবন কথার এই ইতিহাসে রয়েছে আখ্যানের বীজ। সেখানে আছে আধিপত্যবাসী ও অধস্তন বর্গের টানাপোড়েনের বিস্তৃত প্রকাশ। বিভিন্ন উপন্যাসের কাহিনি হয়নে সেই টানাপোড়েনের ছবি ফুটে উঠেছে। এই সমস্ত পাঠকৃতিতে কাহিনি ও কথনের সম্পর্কের ওপর গড়ে ওঠা আখ্যান পাঠককে সামূহিক জ্ঞানের দিকে নিয়ে যায়, যা কি না আবহমান টানাপোড়েনের আখ্যানের সঙ্গে সংযুক্তি লাভ করে মহা আখ্যানের ধারণাকে স্পষ্ট করে তোলে। আমরা এই মুহূর্তে যে পরিক্রমার ভেতর দিয়ে যাচ্ছি, সেখানে কুমার অজিত দত্ত থেকে শুরু করে সমর দেব পর্যন্ত যাঁরাই ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার চলমান জীবনের সমস্ত সুখ-দুঃখের শরিক তাঁরা অন্তর্বৃত বা বহির্বৃত ভ্রমণের অনুষঙ্গে কোনো তাৎপর্যহীন পাঠকৃতি নির্মাণে এগিয়ে যাননি। সুতরাং এখনকার পাঠ-পরিক্রমায় তাঁদের নির্দিষ্ট কয়েকটি গ্রন্থনা অবলম্বনে সম্ভাবনার পুনর্বিন্যাসকে পাঠকের কাছে স্পষ্ট করে তুলে ধরতে চাই। কারণ জানি যে, কথকেরা তাঁদের কথকতায় বাঞ্ছিত পরিসরকে নানা ধরনের আকাঙ্ক্ষা দিয়ে একটা নির্দিষ্ট রূপে গড়ে তোলেন; আর সেখানেই লিপিবদ্ধ হয় তাৎপর্যের দিকে যাওয়ার আনন্দ-বেদনাঘন অভিযাত্রা।

৬.০ আখ্যান ও কুমার অজিত দত্তের নির্মাণ

অস্বীকার করা যায় না যে ভারতবর্ষের উত্তর পূর্বাঞ্চলের বেশ কিছু সমস্যা কুমার অজিত দত্তের দৃষ্টিতে এড়িয়ে যায়নি। অনেক সময় তিনি সমস্যাগুলোকে শুধু ছুঁয়ে গেছেন, তার সঞ্চারী স্তরগুলোকে বিশ্লেষণের আলোকে দেখে নিতে চাননি। তবে তিনি জানাতে চেয়েছেন সময়ের বিলীয়মান সংরূপ ও সেখানে নিহিত রক্তাক্ত জীবনবৃত্তের কথা। সেজন্য কথনক্রিয়ায় সামন্ততন্ত্রকে তিনি প্রত্যাখ্যান করতে পারেন না। সামন্ততান্ত্রিক আদলকে প্রেক্ষাপটে রেখেই তিনি দেখান পৌরসমাজের অনন্বয়, সাম্রাজ্যবাদের বিষক্রিয়া, গোষ্ঠী ও ব্যক্তির সম্পর্কের বিষমতা ইত্যাদিকে। সব মিলিয়ে বহুস্তর-বিন্যাস সময়ের জটিলতাই হয়ে ওঠে অজিত দত্তের প্রধান আধেয়।

'বেদুইন'-এর মধ্যে রয়েছে অপূর্ণতার অজস্র টানাপোড়েন। ধূসর বিষণ্ণতাকে সংবেদনশীল পাঠক উপন্যাসের বয়ান থেকে সহজেই খুঁজে নেবেন। দেশভাগের সমকালীন ও তার পরবর্তী বিস্রস্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক সময়ের প্রতিবেদন এই উপন্যাস। ঘরে-বাইরে আক্রান্ত নগেন্দ্রনারায়ণ ছুটে বেড়িয়েছেন, থিতু হতে চেয়েছেন— কর্মজীবনে— অশান্ত হতে চেয়েছেন খাসিয়া রমণী এলিজার প্রেমে— বৌদ্ধধর্মের অনুশাসনে খুঁজেছেন জীবনের প্রশান্তিকে। অতৃপ্তি নয়, চলমান জীবনের অস্থিরতাই নগেন্দ্রনারায়ণকে তাড়িয়ে বেড়ায়। শেষ পর্যন্ত চলৎশক্তি হারিয়ে হাসপাতালের নার্স এলিজার সুন্দর মুখাবয়বে খুঁজে পান বোধিসত্ত্বকে। সামাজিক পটকথা ও ব্যক্তি অস্তিত্বের এই বঙ্গ জীবনালেখ্যর ভেতর দিয়েই তাৎপর্যে পৌঁছানোর আকল্প নির্মাণ করেন ঔপন্যাসিক কুমার অজিত দত্ত।

রাজনৈতিক বাংলাদেশের হবিগঞ্জ নগেন্দ্রনারায়ণের পৈতৃক নিবাস। পাট ব্যবসায়ী পিতা ধীরেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু,

Scanned with OKEN Scanner

খানসেনাদের আনাগোনা, কাকা বীরেন্দ্রনারায়ণের মাত্রাতিরিক্ত লোভ ও নগেন্দ্রর সচেতন স্বাজাত্যচিন্তা তাঁকে গোপনে দেশ ছাড়তে বাধ্য করেছে। খাসিয়া ব্যবসায়ী লিংডোকাকুর সাহায্যে তিনি সীমান্ত পেরিয়ে চেরাপুঞ্জি হয়ে চলে এসেছেন দূর-সম্পর্কের দিদি-জামাইবাবুর সংসারে, শিলং-এ। সেই তাঁর পথচলার শুরু। এরপর প্রায় সারাটা জীবন ধরেই চলে সংস্থাপনের চেষ্টা। এই পরিক্রমায় তিনি একের পর এক পেরিয়ে যান শিলং-এর কাশীরাম টেইলরের কাছে কাজ শেখা, সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়া, আমিনগাঁওয়ের রেলস্টেশনে কুলিগিরি করা, গাঙ্গুলি ডাক্তারের বাড়িতে আশ্রয় লাভ ও টাইপিং স্কুল খোলা, কলকাতার বাগবাজারে নতুন জীবন শুরু করা, সেনা-জীবনের দ্বিতীয় পর্বে চিন সীমান্তে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া, চিনের বন্দীজীবন কাটিয়ে কলকাতা হয়ে শিলং-এ ফিরে আসা ইত্যাদি পর্বগুলো। এই দীর্ঘ পরিক্রমায় নগেন্দ্রনারায়ণের বাঙালি মনে স্বাজাত্যের অভিমান ও পীড়িত জীবনযাপনের স্পষ্ট উচ্চারণ আখ্যান কথকের অন্তর্নিহিত প্রকল্পটিকে তাৎপর্যমণ্ডিত করে তোলে। তেমনই কিছু উচ্চারণ এখানে—

১. 'বেশিরভাগ গাঁয়ে-গঞ্জে হিন্দুদের স্বাধীনতা হরণ করে নেওয়া হয়েছে, মাঝে মাঝেই দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়। হিন্দুদের হিন্দু পরিচয় নিয়ে থাকতে বেগ পেতে হচ্ছে। তাই যারা স্বধর্মে শ্রদ্ধাবান তারা ওপার বাংলা বা আসাম বা ত্রিপুরায় বিকল্প ব্যবস্থা থাকলে পাড়ি দিচ্ছে সেখানে। পাড়ি মানে কী, অনেকটা পালিয়েই যাচ্ছে তারা।' (যুগলবন্দী, পৃ. ১৩)

২. 'ওদের প্ল্যাটুনে যে বারোজন বাঙালি আছেন তাদের কাউকেই কোনো বাঙালির পাশে শোবার জায়গা দেয়নি। নগেন্দ্রর অবাক লাগল, কেন বাঙালিদের প্রতি এমন আচরণ করা হচ্ছে।' (যুগলবন্দী, পৃ. ১৫৩)

৩. 'হ্যাঁ আমি বলছি কাকিমা। তোমাদের এখনই অন্য কোথাও সরিয়ে নেব, তারপর রাতের দিকে এ-তল্লাট ছেড়ে পালিয়ে যাব। নয়তো তোমাদের স্বতন্ত্র জাতিসত্তার কোনো অস্তিত্ব থাকবে না...।' (নগেন্দ্রনারায়ণ)। (যুগলবন্দী, পৃ. ১৬০)

৪. 'কিন্তু আশ্চর্য! এই যে বাঙালিদের ওপর হানাহানি হচ্ছে এতে কোনো তাপ-উত্তাপ নেই থানা-পুলিশের!' (যুগলবন্দী, পৃ. ১৭৩)

৫. 'বলেনের হাতে রয়েছে একটা দা। এবার নগেন্দ্রকে দেখে বলেন ওই দা নিয়ে তেড়ে আসে, 'ওই ক্যালা ভাগ ইয়ার পরী...... এই টাইপ ইস্কুল এতিয়া তোর নহয় মোর হই গৈছে।' (যুগলবন্দী, পৃ. ১১৭)

৬. 'দুই ভাইকে ডেকে নিয়ে নগেন্দ্র বলে, দেখ ভাই, তোরা এ কোলকাতা ছেড়ে অন্য কোথাও যাবি না। এ-নগর তোদের অনেক কিছু দেবে, দেখিস...।' (যুগলবন্দী, পৃ. ১৮২)

প্রথম পাঁচটি উল্লেখ নগেন্দ্রর বাঙালি সত্তায় অপরতার অনিঃশেষ উচ্চারণ— হবিগঞ্জে তার সূচনা, মিলিটারি ট্রেনিং ক্যাম্প হয়ে ডাউকি পর্যন্ত তার বিস্তার। সব জায়গাতেই তার বাঙালি সত্তা আক্রান্ত এবং সম্পর্কের নিবিড়তা ও দূরত্বের টানাপোড়েনে ক্ষতবিক্ষত। নির্ভরতার আভাস শুধু নির্দিষ্ট বাঙালি পরিবেশ কলকাতায়। এটাই কথকের মননে দীর্ঘলালিত বাস্তব। এই সত্যই নগেন্দ্রনারায়ণের যাপিত জীবনের অন্তর্বৃত্ত সত্য, যা আখ্যান কথনের বিকল্প বয়ান হিসাবে চিহ্নিত হতে পারে। অবশ্য ভারতবর্ষে নগেন্দ্রনারায়ণের দীর্ঘ অবস্থিতির ক্ষণিক অবসরেরও হবিগঞ্জের স্মৃতি উদ্ভাসিত না হওয়াটা একটা প্রশ্নের অবতারণা করে। বাঙালি মননে দেশভাগ-দেশত্যাগের সত্তাবিজড়িত স্মৃতি বারংবার আক্রান্তের ভূমিকা পালনেও অপ্রতিভ থাকবে?

Scanned with OKEN Scanner

৬.১ আখ্যান ও দেবীপ্রসাদ সিংহের নির্মাণ

অবশ্য এই খেদ মিটে যায় 'দেশ' উপন্যাসটি পড়তে পড়তে। দেবীপ্রসাদ সিংহ আদ্যন্ত গল্পকার। 'দেশ' তাঁর প্রথম প্রয়াস হলেও তিনি স্মৃতিসত্তাবিজড়িত বাঙালি মননের যথার্থ রূপকার। যে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার নিজস্ব বয়ান নিয়ে আমরা কথা বলছি সেখানকার আশা-আকাঙ্ক্ষা পীড়িত নাগরিক জীবনকথার অসামান্য শিল্পী তিনি। সংবেদনশীল স্রষ্টাই জানেন, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই সামাজিক হয়ে ওঠে, আবার সামাজিক অভিজ্ঞানই ব্যক্তিসত্তাকে নির্দিষ্ট আদলে গড়ে তোলে। দেশভাগ ও দেশত্যাগের মতো বহু তাৎপর্যমণ্ডিত ঘটনা ঘটে যাবার পরও পুরনো ব্যক্তিসত্তার সৌধ ভেঙে পড়ে। একই সঙ্গে সমাজসত্তাও বারবার নিজেকে বদলে নিতে থাকে। অনেকান্তিক টানাপোড়েনের খেলায় ব্যক্তিসত্তা কখনও নিজেকেই প্রত্যাঘাত করে, কখনও থেকে যায় নিরুত্তর আত্মসমর্পণকারী হয়ে। আবার কখনও গড়ে নেয় বহুত্বব্যঞ্জক 'আইডেনটিটি'র ঘেরাটোপ। অন্যজিকে সাম্রাজ্যবিস্তার আর প্রতিরোধের সচেতন অবস্থানের মাঝে একটা সময় জুড়ে বিচ্ছিন্নভাবে ব্যক্তিই হয়ে ওঠে সাম্রাজ্যের বিপরীত কোটি। ব্যক্তির মন যখন সাম্রাজ্যের বাইরে যেতে পারে না তখন ব্যক্তির আখ্যানও সাম্রাজ্য-আখ্যানের অতিরিক্ত কিছু নয়। তবুও বিপ্রতীপতার খাতিরেই কাহিনির চরিত্রে থাকে প্রত্যাখ্যানের ভঙ্গি, যা অনেক সময় আত্মপ্রতারণার সমার্থক । আর সে-জন্যই শেষপর্যন্ত জীবন পুনর্গঠনের সব গল্প একটাই খাত বেয়ে চলে, সেটা হল স্মৃতি-সত্তা-বিজড়িত অনিশ্চয় ভবিতব্যের পথ। ঔপন্যাসিক দেবীপ্রসাদ সেটা জানেন বলেই বলতে পারেন— 'অনেক ছবি, মূলত একটাই গল্প'।

বলাবাহুল্য পাঠক 'দেশ' উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বের অপেক্ষায় রয়েছেন। তবু স্বয়ংসম্পূর্ণ এই প্রথম পর্বে দেবীপ্রসাদ ভেঙে দিয়েছেন উপন্যাসের সুপরিচিত যান্ত্রিক রৈখিকতার প্রবণতাকে। নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তের অনুকূলে কাহিনি বয়নের চিরাচরিত প্রথা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে অনন্বীয় ব্যক্তিসত্তাকে রেখেছেন ব্যবচ্ছেদের টেবিলে। সময়ের পথ অনেকটা ভেঙে অনিমেষ ও পারমিতা রায়ের সন্ততিরা নির্দিষ্ট ছকে বেঁধে ফেলতে চায় কালের অগ্রন্থিত ইতিহাসকে— যা একই সঙ্গে ব্যক্তিগত এবং চূড়ান্তভাবে সামাজিক। অসহায়তা ও অনিশ্চয়তার একটি পুরনো ছবিকে সামনে রেখে তারা কালনির্দিষ্ট ইতিহাসকে নিজের মতো করে গড়ে নেবার খেলায় মাতে। তারা তৈরি করে তাদের পূর্বপুরুষের অসহায়তার এক একটি গল্প। কারণ অনিমেষ ও পারমিতা কীভাবে, কোন পরিস্থিতিতে শ্রীহট্ট থেকে পালিয়ে এসেছিলেন অসমে, সেই ইতিহাস অনন্ত, অর্জুন, দোয়েল ইত্যাদি কেউ জানে না। অথচ সেটা তাদের পারিবারিক ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সুতরাং আজকের প্রজন্মের কাছে যে ইতিহাস অজানা, অধরা তাকে 'রি-ইনভেস্ট' বা পুনরাবিষ্কার করতে হয় বৈকি। একে একে অর্জুন, অনন্ত, অনন্তের স্ত্রী রিনি এবং বোন দোয়েল এই পুনর্নির্মাণের খেলায় মাতে। 'অনিমেষ ও সীমান্তদস্যু', 'একই বৃন্তে' 'আমার যে দিন ভেসে গেছে', আর 'আঙিনায় ঝুঁকে আছে মেঘ'— এই চারটি শিরোনামে অনিমেষ ও পারমিতার দেশত্যাগের কার্যকারণ যেমন নির্মিত হয় তেমনি বহতা সময়ে আধিপত্যবাদী ও অধস্তন বর্গের দ্বন্দ্বমুখর আখ্যানও তৈরি হয়ে যায়। কথকের নির্মাণ কুমার অজিত দত্তের মতো এখানেও সিলেটের সুনামগঞ্জ থেকে শিলং হয়ে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার গুয়াহাটি শহরে থিতু হয়— সেখান থেকেই বর্তমান প্রজন্ম বিশ্বনাগরিক হয়ে ওঠার বাসনায় বেঙ্গালুরু-শিকাগো পর্যন্ত মানসভ্রমণ সেরে নেয়। সম্পর্কের গল্প তৈরি করতে গিয়ে দেবীপ্রসাদ একে একে বাঙালির যাপনচিত্রের অন্তর্গত অপরতা, সংলগ্নতা, বিদ্বেষ, প্রতিরোধ ও নিষ্ফলতার ছবিগুলোকে বুনে চলেন। ইতিহাসের নিষ্ঠুর অভিঘাতে অনিকেত হয়ে-যাওয়া এখানকার বাঙালি মননে সামূহিক নির্জ্ঞানের যে স্তর গড়ে উঠেছে সেখান থেকেই বাঙালি জীবনের তাৎপর্য সন্ধানী প্রেক্ষিত গড়ে তুলতে চান আখ্যানের নির্মাতা। তবে সেখানেই

Scanned with OKEN Scanner

শেষ নয়, স্মৃতিবিজড়িত অনিকেত কথক সত্তা বাঙালি জীবনের ভবিতব্য হিসাবে সেই কূটপ্রশ্নের কাছেই ফিরে আসেন— সেখানে থেকে শুরু হয় যন্ত্রণা নিরসনের উপায় সন্ধান। সেই নিরুদ্ধ উচ্চারণটি হলো— 'আমরা কী তবে সারাজীবন পালাতেই থাকবো?' ভাঙাগড়ার ভেতর দিয়ে এই যে পরিভ্রমণ এবং উৎসে ফিরে আসা— এটাই ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বাঙালি তথা নিয়তিলালিত আপামর ব্যক্তিসত্তার ইতিবৃত্ত। দেবীপ্রসাদ সিংহ সেই ইতিবৃত্তের গ্রন্থনায় নিজস্ব আকল্পের সন্ধান করেছেন। এখানে রইল কথকের এই প্রয়াসের কয়েকটি নিদর্শন—

১. 'ফারুকের কাপপ্লেট ধুইয়া আলাদা করিয়া রাখিও, বৌমা। তোমরারে তো আবার মনে করাইয়া দেওনলাগে।' (অপরতার সম্পর্ক)

২. 'সিলেটিদের হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে, একটা ফিয়ার্স সাবন্যাশনাল প্রাইড আছে। সিলেটি আইডেনটিটির গর্ব। এখানে সিলেটিরা অন্য বাঙালি কম্যুনিটির চেয়ে আলাদা।' (আত্মগর্বী অথচ বিচ্ছিন্নতার সম্পর্ক)

৩. 'আমাদের একটা বাঙালি সেনা গড়ে তোলা দরকার। কতদিন এরকম পড়ে পড়ে মার খাবো?' (প্রতিরোধ)

৪. 'আসলে বাঙালি হইয়া জন্মাইয়া অনেক পাপ করছি দাদা, আপনে হেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতাছেন।' (সামূহিক অনিকেত বাচন)

৫. 'হাসপাতালের ডাক্তার নার্সগুলো পর্যন্ত কীরকম বাঁকাভাবে কথা বলছিল, যেন আমরাই দোষ করেছি।' (বিদ্বেষ)

৬. 'আমার সমস্ত ফ্যানটাসির ভিলেনদের উপাধি হতো বরুয়া, হাজরিকা, নয়তো গগৈ!' (বিদ্বেষ ও বিচ্ছিন্নতা)

৭. 'রুনুমি কখনো-সখনো তাকে বঙাল বলে ঠিকই, কিন্তু তার পাশে বসে টিফিন ভাগাভাগি করেও তো খায়!' (সংলগ্নতা)

৮. 'আমি বুঝতে পারছিলাম, কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টির দোষ বা অপরাধ একটা গোটা জনগোষ্ঠীর কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া ইজ এ কাইন্ড অফ মিডিয়েভ্যাল।' (সংলগ্নতা ও প্রতিরোধ)

৯. 'মা, আমরা কী গৌহাটি ছেড়ে চলে যাবো? ... কোথায় যাবো মা? আমাদের আর কোথাও যাবার নেই।' (নিষ্ফলতা)

১০. 'একটা কথা মনে এল এখন, মাকে আমরা কেউই কিন্তু শেষ পর্যন্ত সুনামগঞ্জ একবার দেখিয়ে আনতে পারিনি। (অনিকেত চেতনা ও স্মৃতিসত্তা বিজড়িত আর্তি)

এই সমস্ত উল্লেখের পাশাপাশি লেখকের কথনবিশ্বে উদ্বাস্তু বাঙালিদের বিশ্বাস তথা নবপ্রস্থানের আকল্প তৈরি হয় এভাবে—

১. 'আমরা বাংলার অংশ ছিলাম না, ছিলাম আসামের। এখানে রেফারেন্ডাম হয়েছিল। আমরা ইন্ডিয়ার সঙ্গে থাকতে পারতাম, যদি দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাসটা আর একটু বেশি মজবুত হতো।'

২. 'দেশ আলটিমেটলি তো একটা বিমূর্ত ধারণা। অনিমেষ আর পারমিতার এই বিমূর্ততার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে সফর সুররিয়াল ছাড়া আর কীরকম হতে পারে?'

৩. 'অনিমেষ-পারমিতা মানিয়ে নিতে পারেনি, তাই সাফার করেছে। পরের প্রজন্ম রুটলেসনেসকেই একটা বড়ো প্লাস হিসেবে দেখছে।'

৪. 'রেফিউজি হয়ে আমাদের একদিক দিয়ে খুব ভালো হয়েছে। আমাদের কোন দেশ নেই, পিছুটান নেই.... সব দেশই আমার দেশ এবং কোন দেশই আমার দেশ নয়।'

তাহলে দেখতে পাচ্ছি, নিষ্ঠুর ইতিহাসের অভিঘাত যে নির্মম অনিকেত -চেতনার জন্ম দিয়েছে বাঙালি মননে— যা তাকে ইতিহাসের অমোঘ গতিতেই নিয়ে যায় সামূহিক নিশ্চেতনা বা নির্জ্ঞানের স্তরে— সেই অনিকেত-চেতনাই

Scanned with OKEN Scanner

এখানকার বাঙালি যাপনকথার পাথেয় হোক, এটাই লেখকের জ্ঞান নির্মিতির প্রচ্ছন্ন প্রেক্ষিত। কেননা তিনি জানেন ইতিহাসের বিনির্মাণ নিশ্চেতনাকে প্রশ্রয় দেয় না। এখান থেকেই বা বলা ভালো এই ভাবনাপ্রস্থান থেকেই দেবীপ্রসাদ সাম্রাজ্যবিরোধী আখ্যানের আকল্প তৈরি করেন।

৬.২ আখ্যান ও মানিক দাসের নির্মাণ

ব্যক্তি ও জাতিসত্তার আস্থা ও আস্থাহীনতায় ক্রমান্বয়ে যাতায়াত এই যে আকল্প তৈরি করে তাতে আরও একটি মাত্রা যোগ করেন মানিক দাস তাঁর 'ও ঝিঙেফুল, বলো তারে' উপন্যাসে। বহুভাষিক অবস্থানের প্রেক্ষাপটে ও সংস্কৃতির বহুধারঞ্জিত বর্ণমালায় অসমের বাঙালির যাপিত জীবনের বহুমাত্রিক সমাজবাস্তবতা এই উপন্যাসের পশ্চাৎপটে বিধৃত। অবস্থানের পারস্পরিক সম্পর্ক ও সম্পর্কহীনতার এ-এক অনন্যা প্রণয়পাঠ হিসেবে এর আখ্যান গড়ে উঠেছে। কিন্তু বহুমাত্রিক সমাজবাস্তবতায় এমন কতকগুলো চিহ্ন এখানে খুব স্পষ্টভাবেই আছে যা এর আগে এতটা নিবিড়ভাবে শুধু ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা কেন, গোটা বাংলা উপন্যাসের ভুবনে তুলে ধরা হয়নি।

আসলে 'ও ঝিঙেফুল, বলো তারে' ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বাঙালি জীবনের অনুসন্ধান ও আত্মপ্রতিষ্ঠার গল্প। এই আখ্যান একদিকে যেমন সভ্যতাগত সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠতাকে প্রতিষ্ঠার তাগিদে সাম্রাজ্যবাদী নির্মিতির ঝোঁক এড়ায় না; তেমনি অপরতার ধারণাকেও জিইয়ে রাখে। কথকের সাম্রাজ্য-আখ্যানের প্রতি আনুগত্য এবং এর বিপ্রতীপ অবস্থানের মাঝখানে যে একটি 'নো ম্যানস ল্যান্ড' আছে এবং উপন্যাসে যার উপস্থিতি সাধারণত বিরল— মানিক দাস তাঁর বয়ানে তেমনই একটি পরিসরের সন্ধান করেছেন। এই পাঠকৃতিতে লাভ ও লোভের টানে আক্রান্ত রাজা রায়ের বিপরীতে অবস্থান করছে অস্মিতায় উপনিবেশ ভেঙে বাইরে বেরনো অক্লান্ত প্রেমিক অরুণাভ। কলকাতা থেকে ওষুধের কোম্পানির কাজ নিয়ে প্রথমে গুয়াহাটি ও তারপর নগাঁও শহরে থাকার সুবাদে অরুণাভ যে পরিসর তৈরি করে সেখানেই স্ফুটতর হয় অসমের পৌরবাঙালির নাগরিক উচ্চবচতা, সম্পর্কহীনতা তথা সম্পর্ক নবায়নের সম্ভাবনাময় সূত্রগুলো। আর সেখানে অনুঘটকের কাজ করেন শ্যামল কুণ্ডু, যশোদা ও তার বাবাসহ আরও কয়েকজন।

রাজা রায়কে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বাঙালি পরিমণ্ডলেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন লেখক। সে বাংলার এম. এ— অতএব ভাষিক পরিচয়ে একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর। তেজপুরে তাদের বাড়ি, ধনী পরিবার, বাবা পেশায় উকিল, মা বিবাহপূর্ব জীবনে ছিলেন সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারের মহিলা— এখন ধর্মান্তরিত। রাজা তার বাবার মতোই অভিলাষী— সম্বল বলতে রূপ আর কবিতা লিখবার ক্ষমতা। এই ক্ষমতা দিয়েই সে আকর্ষণ করে সুচ্ছন্দা, রাত্রি, তপস্বিনী এবং আরও অনেককে। শুধু যশোদার কাছেই সে বাধা পায়। তার উচ্চাভিলাষ অসমিয়া ভাষায় কবিতার বই ছাপানোতে আগ্রহী করে— সেখানে অরিন্দম চৌধুরীর মতো নামজাদা অসমিয়া লেখক তাকে প্রশ্রয় দেয়, লেখার ব্যাপারে উৎসাহ দেয়— আবার খর্গেশ্বর শর্মার মতো প্রকাশক তাকে ফিরিয়ে দেয়। সে অসমিয়াতে কথাবার্তা বললেও অরিন্দম চৌধুরী বা যশোদা-র পরিবার বাংলাতেই আলাপচারিতা বজায় রাখে।

এই সমস্ত বিবরণ থেকে আখ্যান-কথক পাঠককে এখানকার বাঙালিজীবনে যে তাৎপর্যের দিকে ইঙ্গিত করেন তাতে সম্পর্কহীনতা ও দেউলেপনার পারস্পরিক যুগলবন্দী তৈরি হয়। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বাংলা লেখালেখি ও তার সাফল্য-ব্যর্থতার খতিয়ান দেউলেপনার সূত্রেই কখনও দীর্ঘ উচ্চারণে এবং মাঝে মাঝে সংক্ষিপ্ত উল্লেখে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, — 'ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় কবি-লেখকদের দাঁড়াবার জায়গা নেই, যেটুকু আছে তাতে স্থান সংকুলান হয় না। ধাক্কাধাক্কি, ঠেলাঠেলি চলতেই থাকে। সে-সব সামলে টিকে থাকতে হলে এলেম চাই।' এই উচ্চারণ একদিকে যেমন

Scanned with OKEN Scanner

প্রত্যয়বিনাশী অন্যদিকে তেমনি নিরাশ্রয়ী সত্তার উদ্ভাসন। ব্যক্তি হিসেবে রাজা তার বিশ্বাসের ভিতটা পাকাপাকি ভাবে গড়ে তুলতে পারে না। অসমিয়া ভাষা চর্চা করে প্রতিষ্ঠিত হবার বাসনায়, অসমের জন্য দায়বদ্ধতা না রাত্রির আকর্ষণ বা স্রোতস্বিনীর প্রেম— কোনটা অন্বয়ী ভূমিকা পালন করতে পারে, সে-সম্বন্ধে রাজার আচরণের দোলাচলতা দৃশ্যমান। এই রাজাই আবার 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত অন্য কোন রাজা রায়ের কবিতা নিজের বলে দাবি করতে পিছপা হয় না। আগেও বলেছি, লাভের টান— লোভের টান সাম্রাজ্য-বিস্তারের প্রবল উপাদান। ছন্দহীন ভাবেই সাম্রাজ্য বিস্তৃত হতে চায়— সেই দায়বোধ থেকেই রাজা যে নিজস্ব উপনিবেশ গড়ে তুলেছে, তাতে সাম্রাজ্য আখ্যান নির্মাণের সমস্ত উপকরণই মজুত।

অরুণাভরও সূচনাপর্ব এই আখ্যানের অংশীদার হিসাবেই। সে শিক্ষা, সংস্কৃতির পীঠস্থান কলকাতা থেকে রুজির টানেই এসে পড়েছে বহিবলয়ের মাঝখানে। শ্যামল কুণ্ডুর বিশ্লেষণে ধরা পড়ে যে, অরুণাভ সাহিত্য-সিনেমা-রাজনীতি ইত্যাদি সবকিছু নিয়ে একটা আগ্রাসী দৃষ্টি মেলে ধরতে চায়। অরুণাভ যেন একটা উন্নাসিক জীব। অল্পদিনের মেলামেশাতেই সে জেনে যায়, 'অসমিয়ারা একটা অদ্ভুত জাত। এই জাতটার কিছু হবার নয়।' কিন্তু প্রথমে স্থানীয় বাঙালি শ্যামল কুণ্ডুর প্রতিরোধ ও পরে যশোদা পরিবারের প্রতিস্রোতে পরিশ্রুত অরুণাভ তার সাম্রাজ্যবাদী খোলস থেকে বেরিয়ে আসে। এই পরিক্রমায় অরুণাভর যেভাবে বোধোদয় হয় তা কয়েকটি খণ্ডবাক্যে স্পষ্ট করা যেতে পারে—

১. 'গতকাল ব্রাহ্মসমাজের অডিটোরিয়ামে যশোদার গান শুনলাম। দুর্দান্ত গলা, নিখুঁত উচ্চারণ আর নির্ভুল সুর। একটি অসমিয়া মেয়ে এভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে পারে বলে আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।' (ও ঝিঙেফুল..., পৃ.৪৬)

২. 'যশোদার জীবন যাপনের চৌহদ্দিতে সেই সংস্কৃতি এত উগ্রভাবে উপস্থিত থাকে যে অরুণাভ ঘাবড়ে যায়। অনেক সময় তাল রাখতে পারে না।' (ও ঝিঙেফুল..., পৃ.৮৯)

৩. 'আমি যতটুকু বুঝেছি, অসমিয়াদের জাতি হিসেবে খুব শক্তিশালী মনে হয়েছে, যে জাতির নিজস্ব নাচ আছে, গান আছে, সমৃদ্ধ সাহিত্য আছে, তাদের কেন আত্মবিশ্বাসের অভাব ঘটে তা আমি বুঝতে পারি না।... আমার মনে হয়, অসমিয়া উত্তরপূর্বের লিংগুয়াফ্রাংকা। আমি জানি না ভারতবর্ষে আর কোন ভাষা এরকম সম্মান কোথাও পায় কি না। এমন ভাষা কী করে নষ্ট হবে? কে নষ্ট করবে?' (ও ঝিঙেফুল..., পৃ. ১০১-১০২)

৪. 'বাঙালি এলাকায় থাকার ফলে জীবনযাপনে অসুবিধে হয়নি।... কিন্তু একটা কথা ও বুঝতে পারে না। ও না-হয় বাইরে থেকে এসেছে, এসেছে খুব বেশিদিন হয়নি। ওর পক্ষে পরিধির বাইরে থাকাই স্বাভাবিক। ... অথচ সেই অরুণাভই পরিধির ভেতরে চলে এল আর ওরা (মালিগাঁও-এর বাঙালিরা) এত বছর ধরে এখানে থেকেও বাইরেই পড়ে থাকল। ঢোকার চেষ্টাও করল না, সুযোগও নিল না। আশ্চর্য!' (ও ঝিঙেফুল..., পৃ. ১৪৭)

এইভাবে অরুণাভর মননশক্তির ওপর নির্ভর করে আখ্যানকথক মানিক দাস একের পর এক বুনে যান অপরতার ধারণাগুলোকে। এরপর মূলত যশোদার বাবার সঙ্গে কথোপকথনের সূত্রে অরুণাভ শুরু করে অপরতার কারণ বিশ্লেষণ। এর প্রথম পর্বে চলে নতুন ভাষা আয়ত্তাধীন করার প্রয়াস। অনুরাধা শর্মা পূজারির লেখা উপন্যাস 'কলিকাতার চিঠি' পড়তে পড়তে 'নূতন দেশ আবিষ্কারের মতো আনন্দ পাচ্ছিল অরুণাভ।' (ও ঝিঙেফুল..., পৃ. ৮৭) এটাও তো সেই সাম্রাজ্য-আখ্যানেরই অংশ— নতুন পৃথিবীর দিকে অভিযান এবং সেখানে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা— যে চেষ্টা রাজা করেছিল অসমিয়া ভাষায় কবিতার বই প্রকাশের সূত্রে। কিন্তু এরপর থেকে নতুন সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিবেশে থাকতে থাকতে এবং স্থানীয় ঘেঁটো মানসিকতা সম্পন্ন বাঙালি-মননের বিশ্লেষণ করতে অরুণাভ বিচ্ছিন্নভাবে হলেও সাম্রাজ্যের বিপরীত প্রতিরোধী আখ্যান তৈরি করে এবং তারপর নিয়োজিত হয় দুই অবস্থানের মাঝামাঝি একটি পরিসর সৃষ্টিতে।

Scanned with OKEN Scanner

অরুণাভ বুঝতে পেরেছে, 'পকেটে' থাকার ফলে 'ঘেঁটো' বাঙালিরা অসমিয়াদের সম্পর্কে উদাসীন এবং আজও সেই উদাসীনতা আর অজ্ঞতাই সম্পর্কহীনতার বাতাবরণ তৈরি করেছে। বিষয়টা নিয়ে অরুণাভ ভেবেছে এবং ক্রাইসিসের স্বরূপ অনুধাবন করতে চেয়েছে। তার চোখে ধরা পড়েছে অনেকগুলো ডাইমেনশন। যশোদার বাবা শ্রী বরার সঙ্গে আলোচনাসূত্রে সে জেনেছে, যে অসমিয়াদের প্রসঙ্গে নেতিবাচক মন্তব্য করলে হিতে বিপরীত হবে ; অসমিয়া-বাঙালি সম্পর্কটা অবিশ্বাসের, অসহিষ্ণুতার; বাঙালিরা স্পর্শকাতর বিষয় এড়িয়ে চলে— বিচ্ছিন্নতা আর অসমিয়াভীতি ওদের এভাবে চিন্তা করতে শেখায় ; মহাধুমধামে দুর্গাপুজো করে বাঙালিরা প্রবাসে প্রতিকূলতার মধ্যেও বাঙালিয়ানাকে বাঁচিয়ে রাখার নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যায়। এই বাঙালিয়ানাই স্থানীয় বাঙালিদের কাছে অসমিয়া সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতার রক্ষাকবচ আবার এই বাঙালিয়ানাই অসমিয়াদের কাছে জাতির স্বার্থ-সুরক্ষার পরিপন্থী বাঙালি সাম্রাজ্যবাদ। এই বিপরীত কোটির অবস্থান থেকে অরুণাভ একটি নতুন পরিসর তৈরি করে এবং সেটা এই বাঙালিয়ানাকে প্রত্যাখ্যান করেই তার মত—

'বাঙালিত্ব একটা কঠিন সাধনার ফসল। এটি অর্জন করতে হয়। বাঙালি বাড়িতে জন্মেছি বলেই আমার মধ্যে বাঙালিয়ানা আছে ভাবাটা ভুল।... অমর্ত্য সেনের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তিতে যাঁদের বাঙালিত্ব স্ফীত হয় তাঁদের অধিকাংশই তাঁর কোনো বইয়ের নাম বলতে পারেন না।... প্রকৃত বাঙালিত্ব অর্জন না করার ফলে এখানকার বাঙালিরা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে।... ইচ্ছে করলে একজন অসমিয়াও বাঙালিত্ব অর্জন করতে পারে, আবার একজন বাঙালির মধ্যে বাঙালিত্ব না-ও থাকতে পারে।' (ও ঝিঙেফুল..., পৃ. ৩৩৮-৩৩৯) এর আগেই যশোদার বাবা দিয়ে গেছেন একটি অন্য কিছু সমমুখী পরিসরের ইঙ্গিত। তিনি জানিয়েছেন— "কিছুদিন যাবৎ দু-পক্ষের মধ্যে অনেক পরিবর্তন এসেছে। বিশেষ করে উঠতি প্রজন্ম পজিটিভ দিক নিয়ে ভাবছে। এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের ওপর নির্ভর করছে। যৌথ উদ্যোগে অনেক কাজ হচ্ছে।" (ও ঝিঙেফুল..., পৃ. ২৩১)

'বাঙালিত্ব' এবং 'যৌথ উদ্যোগ' এই দুই পরিসরকে আখ্যানে স্পষ্ট হয়ে উঠতে দেখি তখন মনে হয় সত্যিই এখানকার বাংলা উপন্যাস এক নতুন সমাজ-বাস্তবতাকে বাংলা সাহিত্যের আখ্যানে ছড়িয়ে দিতে চাইছে। সাম্রাজ্যবাদ তথা উপনিবেশের প্রতিস্পর্ধী এই নির্মাণ সম্পর্কের টানাপোড়েনে এক নব্য প্রস্থানভূমি নিশ্চিত করে দেয়।

৬.৩ আখ্যান ও মৃদুলকান্তি দে-র নির্মাণ

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বাঙালি জীবনে সম্পর্ক ও সম্পর্কহীনতায় আরও একটি যাপনচিত্র মৃদুলকান্তি দে-র লেখা 'দ্য লাস্ট সিটি'। তবে এই উপত্যকার অস্থির জীবনাচরণ নয় বরং ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতা, পণ্য-মানসিকতার উদগ্র প্রকাশ, প্রেমের মানসিকতায় আস্তাহীনতা ও আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভের প্রাণান্তকর প্রয়াসেই শেষ ঠিকানা খোঁজার যে অবিরাম গতি এখানকার বাঙালিমানসে ক্রিয়াশীল— এই উপন্যাস তারই নির্মাণ। বিশ্বাসের জগৎ থেকে বিশ্বাসহীনতায় সম্প্রসারিত হয়ে এই আখ্যান এখানকার বাঙালি-জীবনের দলিল হয়ে ওঠে।

'দ্য লাস্ট সিটি' এমনই এক দর্পণ, যাতে অসমের অন্ন-জল-আবহাওয়ায় বেড়ে ওঠা প্রতিটি বাঙালি সত্তা নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে পায়। ঘরে-বাইরে আক্রান্ত এই বাঙালি সত্তা কুমার অজিত দত্তের নগেন্দ্রনারায়ণের মতোই সম্পর্কের নিবিড়তা ও দূরত্বের টানাপোড়েনে ক্ষতবিক্ষত। এই উপন্যাসের তনুশংকর সেই নগেন্দ্রর মতোই অনিকেতচেতনায় আচ্ছন্ন হয়ে শেষ আশ্রয় হিসাবে বেছে নেয় কলকাতা শহরকে। স্বর্ণকমল-পাণ্ডু-কামাখ্যা কলোনির পাহাড়-পাথর-নৌকা-ব্রহ্মপুত্র নদ-রেলব্রিজ-ট্রেন আর অসমের জনক্ষোভ-জনরোষ-ভালোবাসার রক্তবীজ-আলেয়া-ম্যাজিক মানুষ-

Scanned with OKEN Scanner

অন্তর্যামী ক্যাসল— বর্তমানের ঘড়ি ধরে নানা এপিসোড।[৯] তারই উপান্তে নাট্যকার, কবি, পাঁচালি রচয়িতা তনুশংকর নিরবচ্ছিন্নভাবে নানা ধরনের প্রতাপের দ্বারা শাসিত হয় এবং নিজের চেনা অস্তিত্বকে মুছে ফেরার বার্তা দিয়ে আপাত নৈরাজ্য থেকে মুক্তি চায় মায়ানগরী, দ্বন্দ্বের নগরী কলকাতায়— হৃদপিণ্ড খুবলে খাওয়া নগরে বারবার অনুভব করে নাকছাবির টান।

মাইক লাগানো অ্যাম্বাসডরে নতুন বাংলা ছবির অবিরাম ঘোষণা (দ্য লাস্ট সিটি, পৃ. ১৬), ঝংকার সার্কাসের চোঙঅলা লোকটার গলা কাঁপিয়ে বারংবার ঘোষণা : আফ্রিকার সিংহ, আমেরিকার বাঘ, তেপান্তরের বাজপাখি, (দ্য লাস্ট সিটি পৃ. ১৮), আওয়ার ডিমান্ড সেকেন্ড অয়েল রিফাইনারি : ছাত্র-আন্দোলনের মিছিলে যোগ দিয়ে ফ্যান্সিবাজারে জেলযাত্রা (দ্য লাস্ট সিটি, পৃ. ২৩), সুমিত্রামাসির 'বেজবরুয়া ভবনে' নাটকের রিহার্সাল (দ্য লাস্ট সিটি পৃ. ৪০), সাতশো ফুট উঁচু পাহাড় চূড়োয় ভূবনেশ্বরী মন্দিরের দেওয়াল চেপে দাঁড়িয়ে রিনকির আসঙ্গ প্রেম নিবেদন (দ্য লাস্ট সিটি পৃ. ৪২)— এ-সবই তনুশংকরের জীবনে এক একটি অধ্যায়। এই অধ্যায়গুলো পেরিয়ে যেতে যেতেই তনু সিদ্ধান্ত নেয় কলকাতা যাবার। প্রথম আকর্ষণ অবশ্যই রিনকি। তবে দ্বিতীয় কারণ ত্রাস-সঞ্চারিত কাল— যে-কাল কুড়ি দিন রেলধর্মঘটে সামিল স্বর্ণকমল-সুপর্ণার অর্জন থেকে সাহস সঞ্চয় করে— আবার ভেদাভেদ, রক্তক্ষয়, লাশ ইত্যাদির ত্রাসদগ্ধ বর্তমান থেকে নিরাশ্রয়ের চেতনাও জাগিয়ে তোলে। 'একবার দাঙ্গায় হানাহানি ঘটে গেলে, বা নর্মদার ধারে, ল্যাম্পপোস্টের তলায়, বাজার এলাকায়, অফিসগেটের সামনে আঘাত জর্জর মৃতদেহ পড়ে থাকলে, অবিশ্বাস যজ্ঞের ধোঁয়ার মতো সারাক্ষণ আচ্ছন্ন করে থাকে মনোভূমি।' (দ্য লাস্ট সিটি, পৃ. ৬১)

কিন্তু কলকাতায় গিয়ে সূর্যকাকার অসহায়তা, অন্তর্যামী প্যালেসের নির্মম আধিপত্যচক্র, স্বার্থবাহসমাজের চক্রান্ত ফাঁস করে দেওয়ায় তার লিখন সত্তার উপর আক্রমণ এবং সর্বোপরি রিনকির প্রত্যাখ্যান— বহুমুখী প্রত্যাহ্বানের মুখোমুখি হয়ে তনুশংকর বোঝে, জীবনের বাস্তবতার দূরবর্তী সীমা রূপকথার আমেজ নিয়ে হাজির হলেও তা মূলত বাস্তবই থেকে যা। জীবনের এই রূঢ় বাস্তবতা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব নয়। মৃদুলকান্তি তুমুল দক্ষতায় বাঙালি জীবনের এই বাস্তবতাকেই তাঁর আখ্যানে নিয়ে আসেন। এই তাৎপর্যে পৌঁছে কাহিনির অন্তর্বৃত্ত সত্য ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বাঙালি জীবনের রূপায়ণকে সার্থক করে তোলে।

৬.৪ আখ্যান ও সমর দেবের নির্মাণ

সমর দেবের 'লোহিতপারের উপকথা' উপন্যাসের প্রেক্ষাপট ব্রহ্মপুত্র নদীর কূল ঘেঁষা পাণ্ডু অঞ্চলের একটি বস্তি এলাকা। মূলত প্রান্তীয় মানুষের অবগাহন গাথা এই উপন্যাস। বস্তির সবাই উদ্বাস্তু, ছিন্নমূল। জীবনের যাবতীয় অনিশ্চয়তাকে, নানা অপরতার বোধকে জিইয়ে রেখেই এখানে প্রাণের গতি প্রবাহিত। সংকট ও যন্ত্রণা এখানকার মূল সুর। ইতিহাসের ভাগ্যবিড়ম্বিত এই ব্রাত্য মানুষগুলোর জীবনে রাজনৈতিক সমাজের সঙ্গে চূড়ান্ত বিচ্ছিন্নতার পর্বে প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার ব্যবধান লুপ্ত হয়ে গেছে। অপশক্তির অতি সক্রিয়তায় দুর্ভেদ্য অন্ধকারে ঢেকে গেছে বাস্তুহারাদের ভবিতব্য। প্রতাপনিষ্ঠ অধস্তন বর্গ সমাজের আত্মনিমজ্জন, সত্তা-সংকট ও বিমানবায়নের পরিসর এখানে সাবলীলভাবে গড়ে তুলেছেন লেখক।

বস্তিবাসী সমস্ত চরিত্রই শ্রমজীবী— উপার্জনের অনিশ্চয়তা তাদের জীবনের অঙ্গ। এই অনিশ্চয়তার সঙ্গে যোগ হয় জীবনের আরও অনন্বয়। যেন সুবলের বাবা পরাণের এই আর্তস্বর,— "কনে যামু! আমাগো যাওনের জাগা নাই!' (লোহিতপারের উপকথা, পৃ. ৯) লোভের অলাতচক্র জমিদখলের নেশায় বস্তিবাসীদের নিশানা করে নেয়। আর সেই

Scanned with OKEN Scanner

সূত্রেই জমে ওঠে আধিপত্যের রাজনীতি— যার যূপকাষ্ঠে উৎসর্গিত হয় নিরাশ্রয়ী জনতা। কথকের বয়ানে এই কূট রাজনীতি নিয়ত ক্রিয়াশীল—

১. 'ভুট আইলেই একদল কইব আমরা বিদেশি। আরাক দল আইয়া কইব, কেডা কইছে বিদেশি। তুমরা হইলা গিয়া শরণার্থী।' (লোহিতপারের উপকথা, পৃ.১১)

২. 'লুটিস দিছে পুলিশ থিক্যা। আয়েমডিটে যায়্যা পরমান করতে অইব তুমি বাংলাদেশি না।' (লোহিতপারের উপকথা, পৃ.১৬)

৩. 'বস্তির ব্যাকটিরে লুটিস পাঠাইলো ক্যাডা, কও তো? পরাশ্যাই না তো? হেরই তো লাভ অইবো বস্তির মানুষ না থাইকলে। (শেফালি)' (লোহিতপারের উপকথা, পৃ.৬০)

৪. পরেশ সরাসরি গগৈয়ের চোখে চোখ রেখে বলে— 'বিদেশি নোটিশ পাঠাই দিয়ক। গোটেই কেইটা বাংলাদেশি, বুঝিছে নে? গগৈ জানে একথা মোটেই সত্যি নয়। ... এম.এল.এ-র ফোনের পর আর নিরাপদ বোধ করে না সে। ... এম.এলএ-র সঙ্গে কথা বলে ফিট করে রেখেই থানায় এসেছিল (পরেশ)।' (লোহিতপারের উপকথা, পৃ.১৪২-৪৫)

চক্রান্তের শিকার এই অসহায় মানুষগুলোর ভাসমান জীবনের কথাও আখ্যানে ধরে রাখেন কথক—

ক. 'আমাগো জন্ম তো এই দ্যাশেই। বরপেটায় আছিলাম, নগাঁওয়ে আছিলাম। বানে সব ভাইস্যা গেল গতিকেই না আমাগো ব্যাকটিরে লইয়া বাবা এইহানে আইছে।' (পৃ.১০)

খ. 'সিইবার বান আইছিল। নদীর মথাউরি ভাইঙ্গা সব ভাসায়া লয়্যা গেল।' (পৃ.৩২)

বন্যায় ভেসে যাবার মতো এদের যৌন জীবনটাও ভাসমান, কোথাও থিতু হতে পারে না এবং পরেশের বস্তি জ্বালানোর খবরে তারা আবার ব্রহ্মপুত্রের নতুন চরে নতুন করে জীবন শুরু করার অঙ্গীকার করে। ব্রহ্মপুত্রের নতুন জেগে ওঠা চরে ইসমাইল মাইল মাইল জমি দখল করে রাজা হয়ে গেছে। অনেকেই আশা করে ইসমাইল তাদেরও সেখানে ডেকে নিয়ে আসবে। এমনকী হরেন মাস্টারও তার জীবনসঙ্গিনী সংগীতাকে নিয়ে সেই চরেই ডেরা বাঁধতে চায়।

ব্রাত্যজীবনের এই আলেখ্য তার রূঢ় বাস্তবকে সঙ্গে নিয়েই উপন্যাসে উপস্থিত। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বাঙালি জীবনে এই বাস্তবকে অস্বীকার করতে পারেন না কেউই। কাহিনির বাস্তবতার অন্তরালে যে পরিসর তৈরির চেষ্টা করেন কথাকার সমর দেব, সেখানে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ময়নাদ্বীপের মতো মায়ামৃগের আকর্ষণ হয়তো অতিক্রম করা সম্ভব হয়নি, কিন্তু এই ভুবনে বাঙালি জাতিসত্তার বিমানবায়নের অন্তর্বৃত্ত সত্যটি কালোত্তীর্ণ অভিব্যক্তিতে ধরা দিয়েছে।

৭.০ শেষকথা

পাঁচ কথাকারের পাঠকৃতি বিশ্লেষণ করে আমরা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বাংলা উপন্যাসের আখ্যান পরিক্রমায় আপাতত ইতি টানতে পারি। পাঁচটি পাঠকৃতির গ্রন্থনা যদিও ভিন্ন কিন্তু ব্যক্তিগত তথা সামাজিক সম্পর্কের টানাপোড়েন, অস্তিত্বের সংকটদীর্ণ শতধাছিন্ন বাঙালি সত্তার আখ্যানই গড়ে তুলছে। কোথাও নবীনতর সম্ভাবনার পরিসর নির্মাণেও তারা হয়ে উঠেছে তাৎপর্যবাহী। এ-কথা মনে রাখলে এতদঞ্চলের অন্যান্য উপন্যাস পাঠ হয়ে উঠতে পারে অনন্য উদ্ভাসনের আকর।

Scanned with OKEN Scanner

উল্লেখসূত্র

১. ভটাচার্য, তপোধীর, *উপন্যাসের প্রতিবেদন*, ১ম প্রকাশ, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, ১৯৯৯,পৃ.৪৭
২. —, *বাখতিন : তত্ত্ব ও প্রয়োগ*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১০, পৃ.৭৯
৩. চৌধুরী, সুজিত, *লালনমঞ্চ ৫*, ১ম প্রকাশ, শিলচর, ২০০২, পৃ.১২৩
৪. দ্রষ্টব্য ঃ মহেশ্বর নেওগ (সম্পাদিত) গুরুচরিত কথা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৯, পৃ. ৮
৫. বর্মন ও চৌধুরী, শিবনাথ ও প্রসেনজিৎ, *বাস্তব নে বিভ্রম*, শান্তি প্রকাশন, গুয়াহাটি, ১৯৮৬, পৃ.১০১
৬. রায়, দেবেশ, *রক্তমণির হারে*, তৃতীয় মুদ্রণ, সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লি, ২০০৯ পৃ.৪
৭. দত্ত, সম্রাট, *বিশ শতকের আখ্যানতত্ত্বের প্রেক্ষিতে বাংলা উপন্যাস*, ১ম প্রকাশ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১০, পৃ.৪৫
৮. ভটাচার্য, তপোধীর, *আখ্যানের সাতকাহন*, ১ম প্রকাশ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১৩, পৃ.১১
৯. ভটাচার্য, উষারঞ্জন, *মালবিকা চাকমার রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য*, ১ম প্রকাশ, স্রোত প্রকাশনা, ত্রিপুরা, ২০১৫, পৃ.১৪৮

Scanned with OKEN Scanner